প্রথম আলো

তারিখ 1 1 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম 2

সুপ্রিম কোর্টের ফতোয়ার রায় পাঠ্যপুস্তকে নিতে হবে

স র ল গ র ল

মিজানুর রহমান খান

২০০১ সালে ফতোয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হাইকোর্টের রায়ের ১০ বছর পর ২০১১ সালে আপিল বিভাগে শুনানি হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত রায় প্রকাশিত হয়েছিল ২০১১ সালের ১২ মে। এর প্রায় চার বছরের মাথায় সম্প্রতি ফতোয়া বিষয়ে ১৩৮ পৃষ্ঠার একটি মাইলফলক রায় প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে এই রায়ে দস্তখত করেছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক। এই রায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, বাদী ও বিবাদী সবাই একমত হয়েছেন যে বিচারবহির্ভূত ফতোয়া বৈধ নয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ফতোয়া দেওয়া যাবে না, হাইকোর্টের দেওয়া এই অভিমত থেকে আপিল বিভাগ সরে এসেছেন। আবার তা সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল। কারও ধারণা হতে পারে যে তাহলে আপিল বিভাগ ঠিক কী বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে পারলেন না। ছয়জনের মধ্যে কেবল বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিয়া ভিন্নমত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভিন্নমতের সঙ্গে ফতোয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। বিচারপতি গোলাম রাব্বানী ২০০০ সালে *বাংলাবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত নওগাঁর ফতোয়াবাজির একটি ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়োমোটো) রুল জারি করেছিলেন। বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিয়ার মত হলো, রুল দিতে হলে দরখাস্ত লাগবে, সুয়োমোটো করা যাবে না। সে কারণে বিচার্য বিষয়ে তাঁর মূল্যায়ন অজানা থেকে গেল।

২০০০ সালের ২ ডিসেম্বর *বাংলাবাজার পত্রিকায়* নওগাঁ থেকে একটি খবর ছাপা হয়েছিল। শাহিদার স্বামী সাইফুল তালাক শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু আইন অনুযায়ী আর কোনো পদক্ষেপই এই দম্পতি গ্রহণ করেননি। ৯ মার্চ টেলিফোনে শাহিদা আমাকে বলেন, স্বামী-শ্বশুর কেউ রাজি ছিলেন না। কিন্তু হাজি আজিজুল হক ও অন্যরা মিলে ফতোয়া দিয়েছিলেন যে এই তালাক কার্যকর হয়ে গেছে। হিল্লা বিয়ে ছাড়া সাইফুলের স্ত্রী থাকার অধিকার শাহিদার নেই। সে অনুযায়ী, সাইফুলের চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে হিল্লা বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই খবর পড়ে বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল জারি করেছিলেন। এরপর ২০০১ সালের জানুয়ারিতে সব ধরনের ফতোয়াকেই ওই রায়ে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এতে বিপত্তি বাধে; কারণ প্রচলিত আইন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনের সবকিছুরই মীমাংসা করে দেয়নি। তাই কিছু ক্ষেত্রে ফতোয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে আপিল বিভাগ মনে করেছেন।

এখন কথা হলো, যদি কিছু ক্ষেত্রে সঠিক ফতোয়ার দরকার পড়ে, তাহলে অদরকারি ফতোয়াকে কী করে আলাদা করা যাবে। বিচারপতি সয়দ মাহমুদ হোসেন এই মামলার মূল রায় লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন, সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ও মোহাম্মদ ইমান আলী। রায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মসজিদের ইমামদের সচেতন করতে হবে। রায়ে বলা হয়েছে, ইসলামি মতবাদের বিষয়ে ফতোয়াকে কখনো ইসলামি আইনের উৎস মনে করা হয়নি। তাই তা শরিয়তের অংশ হতে পারে না। কিন্তু শরিয়তের বরাত দিয়ে ফতোয়া দেওয়া যেতে পারে।

তবে আপিল বিভাগ সতর্ক থেকেছেন যে ফতোয়া কোনো শাস্তি ঘোষণা করা ছাড়াও ব্যক্তির জীবন বিষিয়ে তুলতে ও সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, কোনো ফতোয়া কোনো ব্যক্তিকে সমাজে হেয়প্রতিপন্ন করতে পারে। দরকারি ফতোয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যদি হাইকোর্টের রায়ের মতে ফতোয়া নিরঙ্কুশভাবে নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তা সংবিধানে প্রদত্ত বাক্‌স্বাধীনতাকে খর্ব করবে।' সুতরাং এটা থেকে পরিষ্কার যে সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে যে আটটি বিষয়ে বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাক্‌স্বাধীনতার রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে, তা কেবল ফতোয়া হওয়ার কারণে কোনো বিশেষ মর্যাদার দাবি করতে পারে না।

আপিল বিভাগ ফতোয়াবিষয়ক সংবেদনশীলতাকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছিলেন। তাই তাঁরা আইনজীবী ছাড়াও মুফতিদের আমন্ত্রণ জানান। রায়ে বলা হয়েছে, আপিলকারীদের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, মুসলিম আইন বিশারদ ও অ্যামিকাস কিউরিরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একমত হন যে বিদ্যমান আইনের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে, কারও দ্বারা এমন কোনো ফতোয়া দেওয়ার সুযোগ নেই। জামায়াতে ইসলামীর নেতা আইনজীবী আবদুর রাজ্জাক তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেছেন, ফতোয়ার নামে বিচারবহির্ভূত শাস্তি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের পাঠ্যসূচিতে মুফতি শব্দটি নেই। মাহমুদুল ইসলাম সবচেয়ে খাঁটি কথা বলেছেন, 'আজকের দিনে মুফতি বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। তাই ফতোয়াদানেরও কোনো প্রশ্ন নেই।' তবে স্মরণাতীত কাল থেকে উপমহাদেশে মুফতি শব্দটি পরিচিত। এখন আপিল বিভাগ বলেছেন, 'বিধিনিষেধ' উপেক্ষা করে যদি ফতোয়া দেওয়া হয়, তাহলে তা আদালত অবমাননা বলে গণ্য হবে এবং আইন লঙ্ঘনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা শাস্তি পাবেন। এখানেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নাগরিকদের, বিশেষ করে যাঁরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতার অনুশীলন করবেন, তাঁদের কাছে এই 'বিধিনিষেধের' বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে। তাই ১৪ বছরের অপেক্ষার পরে যে রায়টি এসেছে, তা গভীর অধ্যয়নের দরকার আছে।

এটি একটি বিরল দৃশ্য ছিল যে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ আদালতকক্ষে সমঝোতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ একটি পরিবেশের সূচনা করেছিল। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে যে আপিল করা হয়েছিল, তার নিষ্পত্তি কার্যত একটি মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছে। হাইকোর্টের রায়ের নির্দেশনাগুলোকে পাঠ্যসূচি ও আইনে সন্নিবেশ করার নির্দেশনা ছিল। আপিল বিভাগ তা একটু সংশোধন করলেও একেবারে অগ্রাহ্য করেননি। এটা পরিষ্কার করেছেন যে এটা তাঁদের একান্ত অভিপ্রায়, 'এই রায়ের আলোকে সরকার ও সংসদ যেন এখন দরকারি পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে।' স্কুল ও মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে এসব তাই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

আদালতের চারটি নির্দেশনা। ১. ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দিতে পারবেন কেবল যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তিরা, যা কেউ স্বেচ্ছায় চাইলে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ফতোয়া কার্যকর করতে কোনো জোরাজুরি বা অবৈধ প্রভাব খাটানো নিষিদ্ধ করা হলো। এ প্রসঙ্গে আপিল বিভাগের দুটি পর্যবেক্ষণের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। 'আমরা ফতোয়াদানের জন্য কোনো বিশেষ শ্রেণি সৃষ্টি করতে চাই না', এবং 'মুফতির মতো শ্রেণি সৃষ্টি করলে গ্রাম এলাকায় কেবল মুফতি দিয়ে ফতোয়া দেওয়া সীমিত রাখা যাবে না।'

দ্বিতীয় নির্দেশনা হলো, 'বিদ্যমান আইনে বহাল থাকা কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তির সুনাম, অধিকার ও মর্যাদাকে স্পর্শ করে, তার লঙ্ঘন ঘটিয়ে কোনো ব্যক্তি ফতোয়া জারি করতে পারবেন না।' প্রচলিত

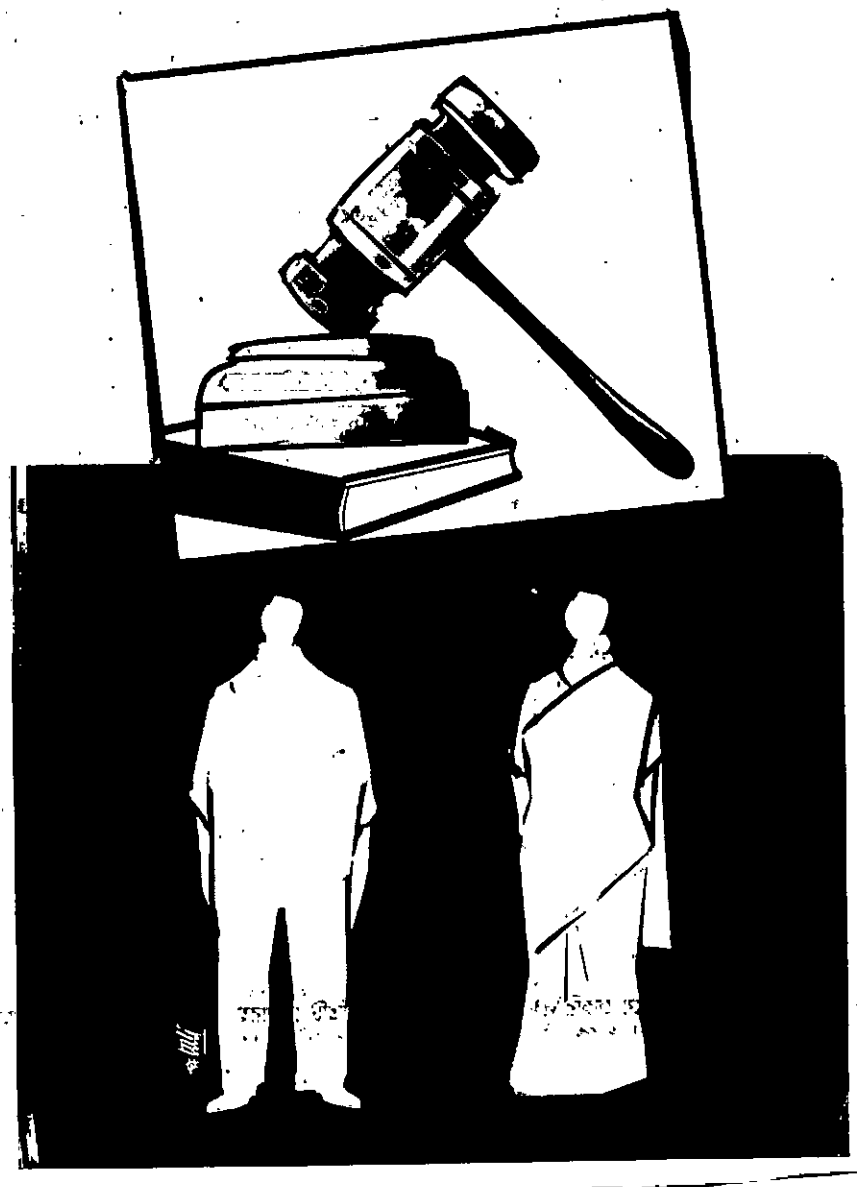

> তাঁদের দুই মেয়ে, সান্তনা (তার বাবা-মাকে রাগ করে তালাক বলার সময় সে ছিল ছয় মাসের গর্ভে) ও সুখী। শাহিদা বলেন, 'ফতোয়ার কারণে আমার ভাগ্যে যা ঘটেছে, তা যেন অন্য কোনো মেয়ের জীবনে না ঘটে'

আইনে কী আছে এবং ফতোয়া কী ধরনের শূন্যতা পূরণ করতে পারে, তার একটি বোঝাপড়া সমাজে না থাকলে এই নির্দেশনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন দুরূহ হতে পারে। তৃতীয়ত, 'ফতোয়ার কারণে কোনো ব্যক্তির ওপর শারীরিক সহিংসতা কিংবা কোনো ধরনের মানসিক পীড়নসহ কোনো ধরনের শাস্তি কারও ওপর আরোপ করা যাবে না।' একে দণ্ডবিধিতে ঢোকানো যেতে পারে। আর চতুর্থ নির্দেশনা হলো, 'নওগাঁর তর্কিত ফতোয়া হাইকোর্ট বিভাগ যাকে বাতিল করে দিয়েছেন, তা সমুন্নত রাখা হলো।'

মোহাম্মদ খালিদ মাসুদসহ তিন অধ্যাপক সম্পাদিত ও কেমব্রিজ প্রকাশিত (১৯৯৬) *লিগ্যাল ইসলামিক ইস্টার পিটিশন, মুফতিস অ্যান্ড দেয়ার ফতোয়াস* বইয়ে লেখা আছে, 'ফতোয়া একটি অভিমত, যা কেবল বিশেষজ্ঞরা দিতে পারেন। এমনকি বিশেষজ্ঞের দেওয়া ফতোয়া কোনো ডিক্রি নয়; সেটা রাষ্ট্র বা আদালতের ওপর বাধ্যতামূলক নয়। ব্যক্তিগতভাবে একজন মুফতির কাউকে শাস্তি দেওয়া বা শাস্তি ঘোষণা করার আইনি কর্তৃত্ব নেই। যে ফতোয়া সহিংসতা ও ফিতনার দিকে ঠেলে দিতে পারে, রাষ্ট্র তা নিষিদ্ধ করতে পারে।' এই উদ্ধৃতিটি আপিল বিভাগের রায়ে আছে। অধ্যাপক মাসুদ ২০১২ সালে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরিয়ত অ্যাপিলেট বেঞ্চের অ্যাডহক সদস্য নিযুক্ত হন। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইফতিখার মোহাম্মদ চৌধুরী তাঁকে শপথ পড়িয়েছিলেন। ফতোয়া সম্পর্কে ওই মন্তব্যটিও পাঠ্যপুস্তক এবং সারা দেশে শুক্রবারের খুতবার ও সংসদের বিবেচনার বিষয়বস্তু হতে পারে।

নওগাঁর আতিথা গ্রামের মানুষ এলাকা ছেড়ে যাওয়া শাহিদা ও সাইফুলকে ভুলতে বসেছেন। ৯ মার্চ ফোনে আতিথার ইউপি সদস্য ও আরেক প্রবীণের সঙ্গে ফোনে কথা হলো। ফতোয়াদানকারী হাজি সাহেব মারা গেছেন, কিন্তু শাহিদা আমাকে বলেছেন, এ ঘটনার কুশীলব শুধু হাজি সাহেব ছিলেন না, তাঁর দুই ছেলেও জড়িত ছিলেন। এক ছেলে বেশি জেদ করেছিলেন। শাহিদার মনে পড়ে, এটা পুলিশবাদী কেস ছিল। হাজি সাহেবের বড় ছেলে তাঁদের কোর্টে নিয়ে গিয়েছিলেন। মামলার কী হয়েছিল, তাঁর কথায় 'এটা আমি কওয়ার পারব না।' শাহিদা গার্মেন্টসে কাজ নিয়েছিলেন। অসুস্থ হয়ে কাজ ছাড়েন। স্বামী সাইফুল গাজীপুরের বোর্ডবাজারে রিকশা চালান। তাঁদের দুই মেয়ে, সান্তনা (তার বাবা-মাকে রাগ করে তালাক বলার সময় সে ছিল ছয় মাসের গর্ভে) ও সুখী। শাহিদা বলেন, 'ফতোয়ার কারণে আমার ভাগ্যে যা ঘটেছে, তা যেন অন্য কোনো মেয়ের জীবনে না ঘটে।' এ ঘটনায় দু-তিনজনের হাজতবাস ঘটেছিল। কিন্তু বিচার হয়নি। জানালেন ওই খবরের প্রতিবেদক শেখ আনোয়ার হোসেন। 'এই ফতোয়াবাজির বিচারহীনতা খুবই দুঃখজনক।' আনোয়ারের মন্তব্যের সঙ্গে আমরা একাত্ম হই। আর আশা করি, নওগাঁর পুলিশ এই মামলা (নম্বর ২, ৩/১২/০১) পুনরুজ্জীবনে অবিলম্বে উদ্যোগী হবে।

● মিজানুর রহমান খান : সাংবাদিক
mrkhanbd@gmail.com